জঙ্গলমহলের লোকসঙ্গীতে সমাজ চেতনার ধারা

জলধর কর্মকার

বহু ভাঙাগড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই রচিত হয় মানবসভ্যতার ইতিহাস। হিমালয় থেকেও প্রাচীন, লাল পোড়ামাটি আর পাহাড়শ্রেণি যার অঙ্গভূষণ; যার বিচিত্র খনিজ ও অরণ্য সম্পদকে যুগ যুগ ধরে হরির লুঠ করেও শেষ করা যায় নি এই জঙ্গল এলাকার মানুষও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে, কভু জয় কভু পরাজয়ের মাধ্যমে রচনা করে চলেছেন ইতিহাস— যে কাহিনি আজও নিরালা বনমর্মরের মতো ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে বহু দূরে রয়ে গেছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে জঙ্গল এলাকার চিরায়ত ঐতিহ্যের বর্ণনা মেলে। বৈদিক যুগে এই এলাকাকে বলা হয়েছে 'কালকাবন'। রামায়ণে বলা হয়েছে 'আটবিক দেশ'। ২০০০ বছর আগে এলাকাটি পরিচিত ছিল 'বজ্জভূমি' বা 'বজ্রভূমি' নামে। জৈনদের পবিত্র গ্রন্থ - 'আচারঙ্গসূত্তে' এই এলাকার বর্ণনা মেলে। ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এই এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। কাঁসাই নদীর তীরে তীরে রালিবেড়া, বুধপুর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমঠ আর জৈন স্থাপত্যের ছড়াছড়ি।

পাহাড়ি উপত্যকা এবং অজস্র নদীনালা ঝরনা ধারাবেষ্টিত এই দুর্গম অঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলিম সাম্রাজ্যবাদীরা বার বার হানা দিয়েও এখানকার ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করতে পারেনি। শেরশাহ, সম্রাট আকবর এবং তাঁর উত্তরসুরিয়া বহুবার চেষ্টা করেও এই এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। ১৭৬৭-১৭৯৯ পর্যন্ত মুহুর্মুহু চুয়াড় বিদ্রোহে ভীত ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল এলাকায় প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য ১৮০৫ সালে ১৮নং ধারা অনুযায়ী বীরভুম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলা থেকে বিভিন্ন স্থান নিয়ে গঠন করেছিল 'জঙ্গলমহল' জেলা। মেদিনীপুরের কালেক্টার এডওয়ার্ড বেরার তৎকালীন গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসকে জানিয়েছিলেন— "পশ্চিমের জঙ্গল এলাকা লম্বায় ৮০ মাইল এবং চওড়া ৬০ মাইল। পূর্বে মেদনীপুর, পশ্চিমে সিংভূম, উত্তরে পাঁচেট ও দক্ষিণে ময়ুরভঞ্জ।"

নদীনালার তীরবর্তী অঞ্চলে তথা পাহাড় পর্বতের কোলে আবহমানকাল ধরে এই এলাকার ভূমিজ, মুন্ডা, লোধা, শবর, কোল, কুড়মি, বিরহড়, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জাতি-জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে লোকশিল্পের

এক অফুরন্ত ভান্ডার। টুসু, ভাদু, ঝুমুর, অহিরা, জাওয়া-করম, বাঁদনা, বাহা, সহরায়, পাতা, ছাতা, দঙ, লাঙড়ে শুধু রিঝে রঙে মাতামাতির উপাদানই নয় খরা-বন্যায় অভাবক্লিষ্ট জীবনে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহে এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, শাসন, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে এই সম্পদ। চুয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের সময়কালে রচিত বিভিন্ন ঝুমুর, টুসু, সাঁওতালি গান শাণিত হাতিয়ারের কাজ করে। বাংলাদেশের সঙ্গীতে, সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় যখন হয়নি তখন এই এলাকার আদিবাসীরাই বন পাহাড়তলি থেকে পিপিলিকার মতো বেরিয়ে হাজার হাজার মানুষের অন্তহীন মিছিলে পা মিলিয়েছিল বিদ্রোহের মাদল বাজাতে বাজাতে। সেদিন তাদের হাতে যেমন ছিল শাণিত হাতিয়ার, মুখে ছিল ঝুমুর টুসুর সুর ঝংকার — যা ছিল যে কোন অস্ত্রের চেয়েও ভয়ংকর।

পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়বঙ্গের এমনই এক জনপ্রিয় লোকগান হল ঝুমুর। ঁ কবি কৃত্তিবাস কর্মকারের ভাষায়—

"রাঁধনাশালে গুনগুনালে রাঁধুনি নুন দিতে ভুলে যায়
ও ঝুমর‍্যা ভাই;
তোর ঝুমরের সুর বুঝা দায়।"

এই হল এখানকার ঝুমুরের আবেদন। জঙ্গলমহলের সর্ববৃহৎ লোকআঙ্গিক ঝুমুর ও টুসুগানে লুক্কায়িত আছে এই অঞ্চলে রচিত বহু পবিত্র হলদিঘাটের স্মৃতিকথা। সমসাময়িক ঝুমুর পদকর্তা ও কবিদের লেখনীতে ও গানে আলোচ্য সময়কালের রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা, দারিদ্র, ক্ষুধা সবকিছুই ধরা পড়েছে।

আমরা সকলে জানি ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৪ অর্থাৎ পলাশী থেকে বক্সার পর্যন্ত ব্রিটিশ সুবা বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করেছে। "বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে" প্রতিভাত হয়েছে। ১৭৬৫ সালে তারা পেয়েছে দেওয়ানীর অধিকার। ১৭৬০ সালে মীরকাশিম বাংলার মসনদের বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ২৬ লক্ষ টাকা এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টোগ্রামের জমিদারি দিয়ে দেওয়ায় জঙ্গল এলাকা ব্রিটিশ পরাধীনে আসে। ১৭৬৭ সাল থেকেই জঙ্গলমহল এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সামন্ত রাজা, জমিদাররা এগিয়ে আসেন ভূমি রক্ষার লড়াইয়ে। ইংরেজরা এ দেশিয়দের এই লড়াইকে ছোট করার জন্য 'চুয়াড় বিদ্রোহ', নেটিভ-বর্বরদের অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দিলেও এই সংগ্রামগুলি ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের একেকটি গণসংগ্রাম। চূয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই জঙ্গল এলাকায় নিজেদের শাসনকে আরোও মজবুত করার জন্য ১৮০৫

সালের ১৮নং ধারা অনুযায়ী ব্রিটিশ গঠন করেছিল জঙ্গলমহল জেলা এবং ১৮৩৩ সালের ১৩নং ধারা অনুযায়ী মানভূম জেলা।

দলমা, পাঁচেৎ, রাকাপ্ জঙ্গলের ধারে ধারে কাঁসাই, নেঁংসাই, দামোদর, সুবর্ণরেখার তীরে তীরে সংগঠিত উপরোক্ত বহু হলদিঘাটের পবিত্র কাহিনি ধরা আছে ওই সময়কালে রচিত বিভিন্ন ঝুমুর গানে।

বরাভূমের বিদ্রোহী নেতা গঙ্গানারায়ণ সিংএর প্রধান সেনাপতি কিষণ সিং, বিসন সিং, জিলপালায়ার কথা আছে ঝুমুর গানে।

হাঁসা রাজা কাঁসা সিং জুড়ল বিসন সিং
এ গো মানভূঞে লাগল লড়াই—
মানভূঞে মরি গেল রাজা হে বিষন সিং
পাগড়ি আইল রে নিসান।
পাগড়ি দেখি রানী ভাঙে আম ডাল যে
পাগড়ি লয়ে সতী যাবে যে—।

প্রবল বিক্রমের কারণে দামপাড়ার নয়ান সিংকে ব্রিটিশ গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বুকে টাড়া কাঠ-চাপা দিয়ে গ্রেপ্তার করে।

"বড় ভেদে গো নয়ান সিং-এর বুকে দিল টাড়া
দু নয়নে বহে ধারা....।"

বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পটমদা থানার বড়াম এর কাছে রূপসান ডুংরির নিচে ১লা মাঘ তারিখে পূজা দেওয়ার সময় ভূমিজ পুরুষ মহিলা আদিবাসীর কণ্ঠে গানের আকারে নাচসহ এখনো গীত হয়—

"বিক্রমজিৎ রাজা ভেল
কলিত পড়ি গেল
ছাতা পখরি রাজার
ঘড়া ডুবি গেল।"

লক্ক লক লকই যে, লক আসছে লুকাও রে আও।
আগু দিগেও ভালবে রে, পেছু দিগেও ভালবে রে,
লক্ আসছে লুকাও রে, আও।"

১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানির ক্ষমতা হস্তগত করার পরই ১৭৬৬ সালে মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট গ্রাহাম সাহেবের আদেশে লেফটেনান্ট ফার্গুসন সৈন্যসহ জঙ্গলমহল অধিকার করার জন্য অগ্রসর হন। প্রধানতঃ

চিয়াড়া, নয়াবাসন, বেলিয়াবেড়া, ঝাড়গ্রাম, জামবনি, শিলদা, চিলকিগড়, লালগড়, কল্যাণপুর ইত্যাদি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা ছিল চুয়াড় বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে ঝাড়গ্রামের রাধানগর দুর্গেরপর ঝাঁটিবনি দুর্গেরও পতন ঘটল। বাঁধগড়াতে হোল প্রচন্ড সংগ্রাম। তথাপি ফার্গুসনের বশ্যতা স্বীকার করলেন না আদিবাসী সর্দার ও সামন্ত রাজারা। মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি, ঝাড়গ্রামের মল্লদেব, শিলদার মল্লরায়, জামবনি, চিলকিগড়, পঞ্চকোট, ধলভূমগড় ও মানবাজারের ধবলদেব প্রমুখ রাজারা চুয়াড় বিদ্রোহীদের মদত দিয়েছিলেন। লোধা শবরদের নেতা কেশু হাড়িকে ফাঁসি দেওয়া হল। কারণ তিনিই প্রথম জঙ্গল কাটার বিরোধিতা করেছিলেন। শিলদা ও গনগনির মাঠে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হল। ক্যাপ্টেন ও কেসীর নির্দেশে গনগনির মাঠে দুর্ধর্ষ নায়েক বিদ্রোহের নায়ক অচল সিংকেও ফাঁসি দেওয়া হল। ক্লান্ত, অবসন্ন, আহত দেহে ধরা পড়লেন বহু নেতা। বাগ্‌দী-বাউরিদের নেতা গোবর্ধন দিকপতি ও মুন্ডা-ভূমিজদের নেতা নিমাই সর্দারের ফাঁসি হল। এইসব লড়াই সংগ্রামের কথা কালের করাল গতিতে এখন স্মৃতি হয়ে গেলেও জঙ্গলমহলের লোকগানে এখনো অনুরণিত হয় সেইসব বিরোচিত লড়াই-সংগ্রামের কথা।

হাঁসা রাজার ছত্রসিং, চড়ল অচল সিং
এহো মলভূঁঞে সাজল লড়াই।
গণগণী টাঁইড়ে, ফাঁসি হেঁল্যাঞ গোবর্দ্ধন
গোবর্দ্ধনের সঙ্গতি নিমাই।

চুয়াড় বিদ্রোহের সময়কালে রচিত ধলভূমের শবর নেতা কেহু হাড়ি ও রঘুনাথ মাহাতর ফাঁসি নিয়েও রয়েছে গান—

কেশু হাঁড়ির ফাঁসি হো'ল
রঘুনাথ মাহাত বাঁধাঞ গেল
বাঁশ বনে ডম হো'ল কানা
রাগে জ্বলছে জঙ্গলমহল জেলা।

বরাভূমের চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা গঙ্গানারায়ণ সিং এর নিয়েও রয়েছে গান—

গঙ্গানারায়ণ রাজাহে, দুলঅকি দুলঅকি
বুলি মাহাতঅ ঘোড়ারি সওয়ার
পাটাবাঁধা সিপাহী, বাঁধে লেগন ভাইরে
পাহাড়ের উপরে হল যে লড়াই।

১৮৩২ সালে চুয়াড় বিদ্রোহের এই দুধর্ষ নেতাকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে

দিতে ব্রিটিশ তার মাথার দাম ধার্য করেছিল ১ লক্ষ টাকা। জঙ্গলমহলের সর্ববৃহৎ অংশ ছিল বরাভূম। ১৫শ-১৬শ শতকে রচিত ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে 'বরাভূমির' উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক বড় অধ্যায়। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নিমডি থানার বামনির অদূরে নাকটিথান নামক জায়গায় ইংরেজ মদতপুষ্ট মাধব সিংকে হত্যা করার পরই জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন। ১৮৩২ এর ১লা মে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঙ্গা নারায়ণ সিং বরাবাজারের মুনসিফ কাছাড়ি লুঠ করেন, কোর্ট জ্বালিয়ে দেন এবং বাজারে লুঠতরাজ চালানো হয়। এরপরই ১৪ই মে তারিখে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী বরাবাজারে ইংরোজদের ক্যাম্পের দিকে এগোতে থাকে। হাতে তাদের উন্মুক্ত তরবারি, টাঙি, ফারসা নাচাতে নাচাতে, ঢোল, ধামসার গুরু গম্ভীর আওয়াজের সাথে মুখে ঝুমুর গান। ম্যাকডোনাল্ড তাঁর বাহিনী নিয়ে সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের ছন্নছাড়া করলেও তাদের পিছু হটানো যায় নি। বাঁধডি, কুইয়ানি, বামনি, সামানপুর, বেড়মা, বড়চাতরমা, আদাড্ডি, আগইডাঙ্গরা প্রভৃতি জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় খন্ডযুদ্ধ। রায়ডি-বেড়াদাতে ঘাঁটি স্থাপন করে ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্রোহ মোকাবিলার চেষ্টা করে। ১৮৩২ এর সারা ডিসেম্বর মাস ধরে রায়ডি, দিগারডি, বেড়্যাডি, বেড়াদা প্রভৃতি জায়গায় চলতে থাকে ব্রিটিশ তান্ডব। বিদ্রোহীরা সম্মুখযুদ্ধে না গিয়ে গেরিলা আক্রমণে ব্রিটিশ ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাহাড়ের গোপন স্থান থেকে শন শন করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা বিষমাখা তীর ইংরেজ বাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তুলে। ব্রিটিশ ফৌজের জন্য আনীত সমস্ত খাদ্য দ্রব্যও রাস্তায় লুঠ হয়ে যাচ্ছিল। রাসেল এবং লেফটেনান্ট কর্ণেল কুপার এর নেতৃত্বে ৫০ রেজিমেন্টের দল বাঁধডি আক্রমণ করতে এসেও ব্যর্থ হয়। প্রলোভন দিয়ে অন্যান্য ঘাটোয়ালদের মন জয় করার সমস্ত ব্রিটিশ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

প্রথম অভিযানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে পরে অবশ্য দ্বিতীয় দফার প্রস্তুতি নিয়ে ব্রাডন, যুগ্ম কমিশনার W. Dent, T. Wilkinson প্রমুখের সুপরিকল্পিত আক্রমণে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে বাধ্য হন। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত যথাসম্ভব জোরদার ব্রিটিশ আক্রমণ চলে। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ইংরেজ বাহিনী দলমা পাহাড়কে ঘিরে রাখে। লাড়কা কোলদের সাহায্য লাভের আশায় গঙ্গানারায়ণ চোরাপথে রাতের অন্ধকারে সিংভূমের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ব্রিটিশ মদতপুষ্ট খরসোয়ানের ঠাকুর চেতন সিং এর দ্বারা হিন্দু সহর থানা এলাকায় তিনি নিহত হন। গঙ্গানারায়ণ সম্পর্কে ইংরেজরা এতই ভীত ছিল যে তাঁর জামাতা এবং আত্মীয়সহ অন্ততঃ একশত জন লোককে দিয়ে তারা গঙ্গানারায়ণেরর ছিন্ন মস্তকটি সনাক্ত করান। মরতে মরতেও

গঙ্গানারায়ণ একাকী ঠাকুর চেতন সিং এর তিনজন লোককে হত্যা করেন এবং ৩০ জনকে ঘায়েল করেন। এই বীরত্বের কারণে পাতকুমের লোকেরা তাঁকে ডাকতেন "সিংহাসুর" নামে।

১৮৫৭ সালে পঞ্চকোটের মহারাজা নীলমনি সিং কেশরগড়ের রাকাপ এলাকার প্রায় দশ হাজার সাঁওতালকে সংগঠিত করে পুরুলিয়াকে দেড় মাস ধরে ব্রিটিশ মুক্ত রেখেছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময়কালীন ঘটনা ধরা রয়েছে ঝুমুরগানে।

হায় একি হইল, সিপাই পল্টন খেপিল
চারদিকে মার মার কাট কাট
যত সিপাই খেপেছে
কাশীপুরের মহারাজা
মহল ছাড়্যে আইসেছে।

জঙ্গলমহলের বহু লোকগানে, টুসুসঙ্গীতে সাবলীল ভঙ্গীতে জয়চণ্ডী পাহাড়তলির বিস্তীর্ণ এলাকার মকর পরবের সময় এখনো শুনতে পাওয়া যায়—

একটা ঝিঙা দুটা ঝিঙা, তিনটা ঝিঙার বেসাতি
ভাল করে রাঁধবি বহু, দাদা যাবেক কাছারি
কাছারিকে গেলেন দাদা, মকদ্দমার কি হো'ল?
মকদ্দমায় ডিগ্রী কর্যে নীলমণি বাঁধাএঃ গেল।

কিংবা

উপরে পাটা তলে পাটা, মধ্যখানে দারোগা,
এ দারোগা সরাঁএঃ দাঁড়া, টুসু যাবেক কইলকাতা।
কইলকাতাকে গেলে টুসু, মকদ্দমার কি হোল,
মকদ্দমায় ডিগ্রী ক'র্য়ে নীলমণি বাঁধাএঃ গেল।

কে এই নীলমণি? পঞ্চকোট রাজপরিবারের এই বিদ্রোহী নেতাই ১৮৫৭ সালের লড়াই এর দিনে রাকাব্ এলাকার প্রায় দশ হাজার সাঁওতালকে সংগঠিত করে পুরুলিয়া জেলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে ছিলেন।

নীলকর সাহেবদের লাভজনক নীল চাষে অবাধ্য হলে চাষীদের ভাগ্যে জুটত অকথ্য অত্যাচার। চামু কামারের গানে ধরা রয়েছে সেই নীল চাষের গান।

১) লাল সুতা নীল সুতা চরখায় কাটিলাম সুতা
বুনাইলম লীল গামছা
সে গামছা হারালি কথায় সজনি

রং — ওগো লীলমনি - গামছা ধরিয়ে করে টানাটানি।
২) ত্রিকুনে বেগুনের বাড়ি - বেগুন বিকে নিলম শাড়ি
সে শাড়ি হারালি কথায় সজনি.... (রং)
৩) পাহাড় ধারে করি চাষ- ভাবনা বার মাস
বিদেশী ময়ূরে খাল্য ধান সজনি... (রং)
৪) চাষ করিলাম সোনা - খাইল বিদেশী ময়না
তখন চামু বলে ত্যজিব পরাণে। (রং)

ব্রিটিশ আমলে চা বাগানে কিংবা আফ্রিকার মরিশাসে কিংবা তুরস্কে খনিতে মাল উত্তোলনের জন্য মানভূম, ধলভূম, উড়িষ্যা এলাকার হাজার হাজার দরিদ্র মানুষকে কুলি হিসেবে একসময় চালান দেওয়া হয়েছে দূর দূরান্তে। কুলি চালানোর ঐ করুন কাহিনি বিধৃত হয়েছে ঝুমুর গানে।

১) চাটি চুটি দিয়ে মোরে
সাম করাইল্য ডিপু ঘরে বঁধুহে
লেখাঞ লিল আমার সাত পুরুষের নাম
।। রং।। হায় রে লম্পট্যা শ্যাম
ফাঁকি দিঞে বঁধু চালালি আসাম।
২) আমি যখন ডিপুঘরে গাড়ি তখন ফটক ধারে
গাড়ির ধুঙা দেখে আমার উড়িল পরাণ। (রং)
৩) মনে ছিল আসাম যাব জড়া পাঙ্খা টাঙ্গাইব
সাহেব দিল আমায় কদালেরি কাম। (রং)
৪) আমরা দু মা বিটি দিনে রাইতে চা কুঁটি
কুঁটিতে কুঁটিতে বহে ঘাম। (রং)
৫) অধম দীননাথ ভনে যে যাবে ভাই আসাম বনে
আর না ফিরিবে নিজধাম। (রং)

এককালের খরা, জরা, যন্ত্রণার কথাও স্থান পেয়েছে আধুনিককালের বিখ্যাত পদকর্তা মিহিরলাল সিংদেও মহাশয়ের ঝুমুরগানে।

১) গরীব হওয়া বেড়ে জ্বালারে ও ভাই পারি না সহিতে
ভখের জ্বালায় ছেইলা কাঁদে উঠিতে বসিতে
(রং) ও ভাই পারি না সহিতে।
২) পিঁধা ট্যানা গটাই ফাটারে লাজে পারি নাই বাহিরাতে

ছিঁড়া কাঁথায় জাড় ঢুকে কুঁকড়ে থাকি রাইতে। (রং)
৩) ছানাপনা রাত কানারে ওভাই হাতড়াঞ বুলে রাইতে
কি করে ডাক্তার দেখাব কানা কড়ি নাই হাতে।
৪) ইহ জ্বালা কিসে যাবে রে ওভাই পারি না বুঝিতে
আগাঞে দাঁড়াতে হবেক সমাজের মাথাতে। (রং)

দ্বিজ গদাধরের ঝুমুরেও রয়েছে মানুষের অভাব যন্ত্রনার কথা—

১) পরের ঘরে পর খাটালি সকাল হলেই যাই বাগালি
খাটিতে খাটিতে বহে ঘাম
(রং) কেইসে বাঁচে প্রাণ সাঁঝে খাইলে সকালে হয় টান।
২) যা ছিল গুঁড়ি বাড়ি সবই লিল লোইখা সুঁড়ি
এখন আ'ড়ে বইসে বহে দুনয়ন। (রং)
৩) লুয়াগড়ের কুটুম আইল্য খাওয়া দাওয়া সটে গেল
মাড়ে ভাতে রাখিল মান। (রং)
৪) দ্বিজ গদাধরে বলে কুকুরের লেখেন মানুষ মরে
ইয়াকালে কি যে হবেক জানে ভগবান। (রং)

তৎকালীন বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় লাভজনক নীলচাষ করাতে গিয়ে নীলকর সাহেবদের যে অবর্ণনীয় অত্যাচার তার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব ছিলেন জঙ্গলমহল এলাকার মানুষ। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা প্রভৃতি এলাকাতে আনুমানিক ৩০০০ নীলকুঠিতে এই সময়কালে এই এলাকা থেকে শ্রমিক চালান দেওয়া তো হয়েইছিল একই সাথে বরাভূম পরগনার বেড়াদা, বেলপাহাড়ি, শিলদা, মানবাজারের বরো থানার নলকুঁড়ি প্রভৃতি গ্রামে বসেছিল নীলকুঠি। পুরুলিয়া শহরের নীলকুঠিডাঙ্গা, রায়ডি-বেড়দার কুঠিটাঁড় প্রভৃতি নামকরণ আজও বহন করে চলেছে নীলচাষের স্মৃতি। বর্তমান নিমডি (ঝাড়খণ্ড রাজ্য) থানার বাড়েদা গ্রামের জিলপালায়া নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংঘবদ্ধ করে প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বুকে সাঁঘাকাঠ চাপা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মারতে মারতে এনে বেড়াদার নীলকুঠিতে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু বেড়াদার এই নীলকুঠির সন্নিকটে শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ উন্মোচন করেন। সুলভ সমাচার, দিগ্‌দর্শন কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের মতো না হোক তথাপি জঙ্গল এলাকার মানুষ ১৮৫৯-৬০ সালের বহুপূর্বেই ১৮৩০-৩২ সাল থেকেই নীলকর সাহেবদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ রচনা করেছিলেন। এই এলাকার ঝুমুর, টুসু প্রভৃতি গানের

মধ্য দিয়ে নীলচাষের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা হয়েছিল এক অপূর্ব উন্মাদনা। সেই সময়কালে রচিত গানে রয়েছে তার প্রমাণ—

শালুক লাড়ার আঁঠার দড়ি
হাল ধরতেই পড়্যে মরি
বাবুর মাঁঞ বাবুর মাঁঞ
আজ হামকে ভখ্যেই মরালি
নীল লো'টা কা'ট্যে কা'ট্যে
হাথ গেল ফাট্যে হে
বাবুর বাপ্ বাবুর বাপ্
দেন টুকু কাঁচা হল্যদ বাঁটে।
দাদন ফেলঅঁ হপকি সাহেব
দশ টাকা লেঁই হে
মহাজনকে বহাল ক্ষেতে
করি নীলচাষ হে।

টুসু সঙ্গীতেও রয়েছে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ - প্রতিরোধের কথা।

গোপাল মাহাতঅ বেড়ে রাগী
লাগড়াই পিটিল খাড়ি
লিল চাষ উঠাঁঞ দিল
বিশ্বনাথ সরদারে হে
সে তো ডিবার আলো
বিটি ছ্যালার কুলহি বুলা লয় ভালো।

কেবলমাত্র ঝুমুর বা টুসু সঙ্গীতেই নয় ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীতে জঙ্গলমহলের প্রতি গ্রামে যে জাওয়া ও করম উৎসব হয় সেই করম গানে এখনও ধ্বনিত হয় নীলচাষের প্রতিবাদী সুর।

সুন্দরবনের মাটি আড়ি, বুনল মঁঞ ধান
সেই ধান খাই গেলা মেজুরারে
নীলক্ষেতে ধান চাষ দেখবি তরা আয়
সেই ধান লেই গেলা মহাজনেরে।

স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের চাপে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে ১৯১১ সালে রদ করতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ। কিন্তু তৎকালীন মানভূমের ৭২ শতাংশ লোকের

ভাষা বাংলা হলেও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার অজুহাতে মানভূমকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিহারের সাথে। বাংলাভাষীর হৃদয়ে জোর করে হিন্দী চাপিয়ে দিয়ে যত্রতত্র হিন্দী স্কুল নির্মিত হতে থাকলে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন এখানকার মানুষ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে (১৯০৫) বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের সময়কালের চারণ কবিদের মতোই টুসু ও ঝুমুর গানের মাধ্যমে জঙ্গল এলাকার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা বঙ্গভুক্তির প্রশ্নে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আন্দোলনের বার্তা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই ভাষা আন্দোলন তথা 'টুসু সত্যাগ্রহ' সমগ্র দেশে ঝড় তুলেছিল। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন লোকসেবক দলের সদস্য অতুলচন্দ্র ঘোষ, আশ্রমমাতা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, গিরিশ মাহাত, ভজহরি মাহাত প্রমুখ।

১৯৫৬ সালের ৬ই মে বর্তমান পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চার পাকবিড়রা থেকে সহস্রাধিক ভাষাপ্রেমী মানুষ পদব্রজে কলকাতায় আসেন টুসু, ঝুমুর গাইতে গাইতে। যে টুসুগানগুলি তখনকার দিনে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল—

"আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোরা কি তারে
বাংলা ভাষা রে।

এই ভাষাতেই পর্চা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাতপুরুষের হকপাটা।"

এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাতপুরুষের আমলে
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে।
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাগ্যের চির অধিকার
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার।

বিহার পুলিশের জুলুম এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদও ঘোষিত হয়েছিল এই টুসু গানে।

"শুন বিহারি ভাই—
তোরা রাখতে লারবি ডাং দেখাঁঞ....।"

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, লোকসেবক সংঘ এবং অন্যান্য সংগঠন ও বাংলা ভাষাপ্রেমী মানুষের এই লড়াই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর এতদিন থেকে বিহারে থাকা মানভূমকে ভেঙে তিন টুকরো করে পুরুলিয়াকে আনা হয় পশ্চিমবাংলার মধ্যে।